দৈনিক ইনকিলাব ১৬

তারিখ 11 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমস্যার আবর্তে মাধ্যমিক শিক্ষা

মোঃ আব্দুস সাত্তার

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আমাদের নবম ও দশম শ্রেণীতে যে পাঠক্রম চালু রয়েছে তা গুণগতভাবে কতটুকু অগ্রসরমান এবং আত্মনির্ভরশীল ও কর্মোদ্যোগী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট তা বিচার্য। পাঠক্রমে আবশ্যিক ৯০০ নম্বর ছাড়াও একটি ঐচ্ছিক বিষয় নিতে হবে। ঐচ্ছিক তালিকায় আছে উচ্চতর বাংলা, আরবী, ইংরেজী, ফার্সী, উর্দু, সংস্কৃত, পালি, উচ্চতর গণিত, ললিতকলা, সংগীত ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি। উপরোক্ত ঐচ্ছিক বিষয়গুলো আমাদের দেশের মত অনুন্নত ও দরিদ্রতর দেশের শিক্ষার্থীকে কতটুকু কর্মোদ্যোগী বা আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে সক্ষম?

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে সাধারণ ও বৃত্তিমূলক এ দু'ধারার সু-সমন্বয় হওয়া উচিত। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো— শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যত পরিবেশ, জীবনযাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য বিষয়াদির প্রতিফলন পাঠ্যসূচীতে প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা মিটানোর লক্ষ্যে একজন শিক্ষিত নাগরিকের পক্ষে যেসব বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন সেসব বিষয়ে অন্ততঃ মৌলিক জ্ঞান বিতরণের নিশ্চয়তা বিধানই হলো- মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। এ কথাগুলো মনে রেখে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা ছাড়া যেসব বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়াদি পড়ানো হয় সেগুলো হচ্ছে— কারিগরী ডিপ্লোমা, বাণিজ্য ডিপ্লোমা, সাব-ওভারসিয়ার পরীক্ষা, জরিপবিদ্যা, ট্রেড কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা, বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ্যা, পাট প্রযুক্তিবিদ্যা, চামড়া প্রযুক্তিবিদ্যা, ছাপা ডিপ্লোমা, সচিব বিজ্ঞান ডিপ্লোমা, মুদ্রাক্ষরিক ডিপ্লোমা ইত্যাদি। এসব পড়ার বিষয়বস্তু দেশের সমকালীন আর্থ-সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে চিন্তাভাবনা করে সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঢেলে সাজাতে হবে এবং বাস্তবভিত্তিক করে পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

ডঃ কুদরত-ই-খুদার শিক্ষাকমিশনের (১৯৭৪) প্রতিবেদনে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এ বাধ্যতামূলক শিক্ষার পেছনে অবশ্যই কতগুলো অসুবিধা রয়েছে। এদেশের নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন ঘরের ছেলেরা শিশু বয়সেই পরিবারের জন্য উপার্জন করতে বাধ্য হয়। তাই, তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধান ছাড়া বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন হবে। এ জাতীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি গরীব ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাপোকরণ, পোশাক, আর্থিক সাহায্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। এসব ব্যবস্থাসহ অবৈতনিক শিক্ষার স্তর পঞ্চম শ্রেণী থেকে বাড়িয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার পদক্ষেপ নিলে তা ফলপ্রসূ হবে।

এখানে, লক্ষণীয় দ্রুত সম্প্রসারণশীল জনসংখ্যার সাথে তাল রেখে শিক্ষার অধিকারকে সর্বজনীন করতে হলে শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন। বাংলাদেশের শিক্ষাকমিশনের প্রতিবেদনে (১৯৭৪) প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, শিক্ষা খাতে মোট জাতীয় আয় (G.N.P)-এর শতকরা ৫ ভাগ অর্থ বরাদ্দ সম্ভব করে মোটামোটিভাবে তার শতকরা ৬০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য, শতকরা ২৫ ভাগ বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষার জন্য, বাকী অংশ মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের জন্য বরাদ্দ করা হোক। যোগ্যতানুযায়ী যাতে প্রতিটি শিশু শিক্ষার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা ব্যয় নির্ধারণ করতে হবে। তফসিলি ও অন্যান্য উপজাতীয়দের ন্যায় ক্ষেতমজুর ও শ্রমিকের সন্তানের জন্যও তেমনিভাবে বৃত্তি ও অনুদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় তা কতটুকু সম্ভব এ ব্যাপারে অনিশ্চয়তাও বিদ্যামান। দেশের গোটা বাজেট বরাদ্দের সিংহভাগই যেখানে বিদেশী সাহায্য ও অনুদানের উপর নির্ভরশীল সেক্ষেত্রে এ জাতীয় পদক্ষেপ কতটুকু সম্ভব তা ভেবে দেখার বিষয়। উপরন্তু, উপরোক্ত ব্যবস্থাদির পাশাপাশি তফসিলি ও অন্যান্য উপজাতীয়দের ন্যায় ক্ষেতমজুর ও শ্রমিকের সন্তাদের জন্যও তেমনভাবে বৃত্তি ও অনুদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। উক্ত শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ স্থানীয়ভাবে কর আদায়ের মাধ্যমে আদায়ের সুপারিশ করেন।

পূর্বোল্লিখিত বৃত্তিমূলক শিক্ষা হবে প্রান্তিক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত সকলের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করা একটি দুরূহ কাজ। এদের অনেকেই নিজের উদ্যোগে স্বনির্ভর হয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নেবে এবং তজ্জন্য সহজ শর্তে মূলধন প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ্য, শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) সুচিন্তিত সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমন্বয়ে এখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তরে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, নবম ও দশম শ্রেণীতে বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভসহ একাদশশ্রেণীতেও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি স্মৃতিনির্ভর, বর্তমানে দুর্ভাগ্যজনকভাবে নকলনির্ভর ও সার্টিফিকেটসর্বস্ব। তত্ত্ব ও তথ্যসন্ধানী সমকালীন পরীক্ষাপদ্ধতি জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর দিকে তাকালে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

১। সকল স্তরের শিক্ষা থেকে আহরিত জ্ঞান নিরূপণ ও মূল্যায়ন;

২। উচ্চতর শিক্ষা স্তরের আনুকূল্যে শিক্ষার্থীর প্রবণতা, আগ্রহ, সহজ বুদ্ধি ও শক্তি যাচাই;

৩। শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের গতিধারা এবং কোন অবস্থায় তার প্রকৃত বিকাশ ঘটবে তা নির্ধারণ;

৪। সামাজিক কাজ ও পেশায় শিক্ষার্থীর যোগ্যতা মূল্যায়ন;

৫। পরীক্ষার ফলাফল ও সনদপত্র বিতরণ।

আমাদের দেশের প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি পর্যালোচনায় এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে মিল পাওয়া যাবে না। বাস্তবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান লাভের পরিমাণ জানার কোন ব্যবস্থা নেই। বাছাবাছা কিছু প্রশ্নোত্তর মুখস্ত করে বা অন্য উপায়ে পীরক্ষার খাতায় তুলে দিতে পারলেই সুফলের পাওনাদার হওয়া যায়। এভাবে আর যাই হোক পীরক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। এ প্রবণতা গ্রামীণ কেন্দ্রসমূহে সর্বাপেক্ষা বেশ। এগুলোতে পরীক্ষার্থীদেরকে গুণগ্রাহী, হিতাকাঙ্ক্ষী ও অভিভাবকগণের অনেকেই পরীক্ষার্থীদেরকে অসদুপায় অবলম্বনে উৎসাহ ও সহায়তা করে যাচ্ছেন। সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় সকল স্তরের পরীক্ষা কেন্দ্র তা গ্রামেই হোক আর শহরেই হোক— এ নৈরাশ্যজনক ও লজ্জাকর পরিস্থিতি অল্পবিস্তর বিরাজমান। একটা জাতির জন্য এর চেয়ে অবক্ষয় আর হতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তা গ্রামেই হোক আর শহরেই হোক; শিক্ষার্থীর হোক আর অভিভাবকেরই হোক ফিরিয়ে আনতে না পারলে এ দুঃখজনক পরিস্থিতির নিরসন সম্ভব নয়। এ প্রবণতার জন্য কোন পক্ষকেই একা দায়ী করে লাভ নেই। সামগ্রিকভাবে সর্বমহলের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতাই তার নিরসনের সহায়ক হতে পারে।

আমাদের পরীক্ষাপদ্ধতিতে এ পর্যন্ত বহিঃপরীক্ষার উপর জোর দেয়ার ফলে সত্যিকারের মেধাবী প্রতিভাবানদের চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পরে। এ সমস্যা সমাধানে আন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার সমন্বয় সাধন করা ছাড়াও আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতির অন্যান্য দিকগুলোও প্রয়োজনমত প্রয়োগ করতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি বছর চারটি আন্তঃপরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় এ নম্বরসমূহ যুক্ত করতে হবে। বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বহিঃপরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে। চূড়ান্ত ফলাফলের সময় আন্তঃপরীক্ষার ফলও যুক্ত করতে হবে। এ পদক্ষেপে দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কেউ কেউ আনতে পারেন, তবে এ ছাড়া কোন বিকল্পও নেই।

বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে, কালের সেরা সংকট এখন শিক্ষাসংকট, যা এখন শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন পরীক্ষাপদ্ধতি কবে চালু হবে, আদৌ চালু হবে কি-না কেউ বলতে পারে না। বর্তমান পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত খবরের [illegible] উদ্বেগ ও আশংকা দেখা দিয়েছে সর্বত্র। পরীক্ষার সাফল্য ও ব্যর্থতার মাঝখানে যারা ফলাফল স্থগিত থাকার কারণে অনিশ্চয়তায় ঝুলছেন তাদের মর্মযাতনা ও বেদনা সহজেই অনুভবযোগ্য। সংশ্লিষ্ট বোর্ডসমূহের গাফলতি, ঔদাসীন্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্যর্থতাই এ জন্য অধিক দায়ী।

পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে বড় ছুটির সময় শিক্ষার্থীদের কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্য গ্রামাঞ্চলে বিশেষতঃ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে প্রেরণ হয়। আমাদের মত দরিদ্র ও নিরক্ষরের সংখ্যাধিক্যের দেশে ছাত্র সমাজ নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গ্রামোন্নয়নের [illegible] কল্যাণকর কার্যক্রমে ছুটি ব্যয় করতে পারে। একে ব্যবহারিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্তি করলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকবে। আশার কথা জাতীয় পর্যায়ে ইদানীং ছাত্র ব্রিগেড গঠিত হয়েছে। এর সুফল কার্যক্রমের ফলে ছাত্রসমাজ তথা দেশ উপকৃত হবে— এ প্রত্যাশা রইলো।

মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানপদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান ছাড়াও পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত কাজে শিক্ষককে সময় দেয়া উচিত।

চলবে

শিক্ষা ও বিজ্ঞান